International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 78-82
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

‘দ্বিখণ্ডিত’ : তসলিমা নাসরিনের বিতর্কিত আত্মজীবনী

জাহিরুল রহমান মন্ডল

Abstract

“Dwikhondito is one of the best auto biography of Taslima Nasreen. It is the third volume of Taslima’s autobiography. This autobiography was written in 2003. Ka (dwikhondito’s other name) has been banned by the Dhaka Court. The same book published in West Bengal under the title ‘Dwikhondito’ with a few new chapters, was banned subsequently by a ruling of the Kolkata high court on November 18 following an appeal by the poet Hasmat Jalal, taslima defended the incidents depicted in the book as part of her life. In Dwikhondito, taslima mentioned a mixture of good things and bad things in her life; whatever happened in her life he tried to narrate faithfully. Taslima came under severe attack by several progressive writers and intellectual who described ‘Dwikhondito’ as a book written with the business aspect in mind. Sometimes it is called Pornography, autobiographical Kamsutra. He writes against fanaticism in her autobiography ‘Dwikhondito’. Taslima speaks about the truth of religion. What is the controversial story behind the autobiography ‘Dwikhondito? It is the main fact of this essay.

Article DOI: 10.29032/IJHSSS.v4.i3.2017.1-10

তসলিমা নাসরিন এমন একজন লেখিকা যিনি স্পষ্টবাদী, সত্যকে খুব সহজভাবেই প্রকাশ করেন। এই নির্মম সত্যই বোধহয় তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আর সেইজন্যই একের পর এক নির্বাসন। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নীরবে নিভৃতে নির্বাসিত এক নারী লেখিকার ক্রন্দন, সহৃদয় পাঠক হিসাবে হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় বইকি। তসলিমার অনেকগুলি কবিতা, উপন্যাস, আত্মজীবনীর মধ্যে ‘দ্বিখণ্ডিত’ নামের লেখাটি বর্তমানে পাঠক সমাজে বেশ ঝড় তুলে দেয়। কারণ লেখাটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। নিষিদ্ধ কোনো জিনিষের উপর মানব মনের ঝোঁক চিরন্তন। তাই আত্মজীবনীটি নিয়ে পাঠক মনে কৌতূহলের অন্ত নেই। তবে একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর যে ধারা রাসসুন্দরীর ‘আমার জীবন’ (১৯৬৮) থেকে শুরু হয়েছিল, সেই ধারার ‘দ্বিখণ্ডিত’ নিঃসন্দেহেই ব্যতিক্রমী। আত্মজীবনীকার নিজের জীবনের ভালো ভালো কথাগুলি আত্মজীবনীতে লেখেন। স্পষ্টবাদী, নির্মম সত্য প্রকাশের সাহস কজন লেখক বা লেখিকা দেখাতে পেরেছেন তা হতে গুণে বলতে হয়। তসলিমা নাসরিন এই দিক থেকে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। নারীদের যন্ত্রণার কাহিনি, নারীর প্রতি পুরুষের ক্রমাগত অত্যাচার ও শোষণের কথা, ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্টভাষণ তাকে সমাজ ও দেশের শত্রু করে তুলেছে। ‘দ্বিখণ্ডিত’ আত্মজীবনীটি বিশ্লেষণের সূত্রে আমরা ব্যাপারটিকে আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবো।

লেখিকার আত্মজীবনী মোট সাতখন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে ‘আমার মেয়েবেলা’ (১৯৯৯), ‘উতল হাওয়া’ (২০১২), ‘দ্বিখণ্ডিত’ (২০০৩), ‘সেইসব অন্ধকার’ (২০০৪), ‘আমি ভালো নেই ভাল থেকো প্রিয়দেশ’ (২০০৬), ‘নেই কিছু নেই’ (২০১০), ‘নির্বাসন’ (২০১২)। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে যে কটি আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বহুখণ্ডে বিন্যস্ত প্রথম আত্মজীবনী এটিই। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন ‘সত্যকে যারা লুকিয়ে রাখেনা’। আসলে তিনি কোনো সত্যকে লুকিয়ে রাখেননি। তসলিমার কথায় – ‘আত্মজীবনী লেখা কি অপরাধ?’ জীবনের গভীর গোপন সত্যগুলো প্রকাশ করা কি অপরাধ? আত্মজীবনীর প্রধান শর্ত এই যে, জীবনের সব কিছু খুলে মেলে ধরবো, কোনো গোপনকথা কোনও কিছুর তলায় লুকিয়ে রাখব না। যা কিছু গোপন, যা কিছু অজানা তা বলার জন্যই তো আত্মজীবনী।

'দ্বিখন্ডিত' গ্রন্থটি ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এটি লেখিকার আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড। বাংলাদেশে 'ক' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটি নিষিদ্ধও করা হয়। তবে 'দ্বিখণ্ডিত' নামে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ পাবার কিছুদিনের মধ্যে এখানেও গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়। একবছর নয় মাস ছাব্বিশ দিন পর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে গ্রন্থটির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় বইটি নিয়ে দেশ বিদেশে প্রচুর আলোচনার ঝড় উঠে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গেল গেল রব তোলে। বই এর সঙ্গে সম্পর্কহীন মেকি পাঠকদল বইটি না পড়েই মন্তব্য করতে থাকে। কি এমন ছিল বইটির মধ্যে যার জন্য এমন কিছু যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে বারবার। আমরা একনজরে সেদিকে দেখব।

'দ্বিখণ্ডিত'তে এক নারীর ঘরবাধার স্বপ্ন কিভাবে প্রতি মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ে তার কথা উঠে আসে। লেখিকার অকপট স্বীকারোক্তিই সবথেকে বড় ভয়ানক ব্যাপার হয়ে উঠে। আর এখান থেকে বিতর্কের সূত্রপাত। কার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন তার বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখিকা দিতে থাকেন। অন্যদিকে তাকে নিয়ে সংবাদমাধ্যম, বাংলাদেশের প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিকদের দল ও ঘাতক মৌলবাদীরা যে কর্মযজ্ঞে মেতেছিলেন তার সন্ধান গ্রন্থটির মধ্যে পাই। প্রতিবাদী নারীসত্তা ও অন্যদিকে সাধারণ লেখিকা সত্তার দ্বৈরথের গ্রন্থটির নাম 'দ্বিখণ্ডিত' হতে পারে। তবে লেখিকা এই গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে বলেন কলকাতায় প্রকাশিত আত্মজীবনীর তৃতীয়খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' এর বাংলাদেশ সংস্করণের নাম 'ক'। প্রথমেই 'ক' ই ছিল নাম। পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশক 'ক' নামটায় আপত্তি করায় নাম দিয়েছি 'দ্বিখণ্ডিত'। 'ক' অর্থাৎ বলা বা Speak, তিনি তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পর্বের কথাই এখানে জানিয়েছেন। 'দ্বিখণ্ডিত' তসলিমার অন্যান্য আত্মজীবনী থেকে বেশ আলাদা। 'আমার মেয়েবেলা', 'উতল হাওয়া'য় তাঁর জীবনের, তাঁর পরিবারের ও সমাজের কথা বেশি করে এসেছে। যাতে মিশেছিল এক নির্যাতিত শোষিত নারীর আত্মঅভিমান। আর দ্বিখণ্ডিততে সেই আত্মভিমানের বিস্ফোরণ ঘটেছে। আত্মজীবনীটিতে বর্ণিত সময়কাল ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ অর্থাৎ ৫ বছর। ততদিনে তিনি ডাক্তার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্বামী রুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ পড়েছে। উপন্যাসটির সূত্রপাত ডাক্তারি জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা দিয়ে। তসলিমার ছোট বোন ইয়াসমিনের বান্ধবী রেহেনার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য তিনি নিজেই লজ্জিত হন। তাঁর কথায় উঠে আসে, 'তুই নিতে পারলি টাকা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এত লোভ তোর। ছিঃ!' এই আত্মবিশ্লেষণ একমাত্র তসলিমার লেখার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের প্রথম উপার্জিত অর্থ যে কোনো ব্যক্তির মনেই দায় কাটে। কিন্তু সেটি যখন কোনো ব্যক্তির মনে আঘাত দিয়ে উপার্জিত হয় তখন তার মধ্যে কোনো সুখ খুঁজে পাওয়া যায়না। লেখিকার 'ছিঃ ছিঃ' আত্মধিক্কারের মধ্যে দিয়ে এক যুক্তিশীল অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।

সূর্যকান্ত হাসপাতাল ছাড়েন বিশেষ কিছু কারণে। এখান থেকে পরিবার পরিকল্পনার অফিসে যোগ দেন। সেখানে সীমাহীন দুর্নীতির কথা তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। মুজিবুর রহমান নামে এক কর্তার অঙ্গুলি হেলনে অফিসটি চলে। এখানেও নারী হিসাবে তিনি বঞ্চিত। কেবলমাত্র গৃহক্ষেত্র নয় কর্মক্ষেত্রেও নারীকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে লেখিকা মনে করেন। লেখিকার কথায় উঠে আসে তারই বহিঃপ্রকাশ - 'কী করে এই অফিসটি চলছে। তা বুঝতে চেয়ে তুমি বোকা বনে যাও। বোকা বনে যাও, কারণ এই অফিসের নাড়ি নক্ষত্র জানার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয় না।' গ্রাম্য মহিলাদের স্বাস্থ্য, তাদের পরিবারের পুত্র সন্তান আকাঙ্ক্ষা - ডাক্তার হওয়ার সুবাদে এই বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন লেখিকা। এই বৈষম্যের কারণ নির্ধারণ করেছে শাস্ত্র, পুরাণ, কোরাণ ঘেটে। 'নির্বাচিত কলাম' তারই এক চরম বহিঃপ্রকাশ।

তসলিমার জীবনে প্রধান ট্রাজেডি হল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ। রুদ্রকে নিয়ে গড়ে তোলা স্বপ্নের ঘর ভেঙ্গে যাবার কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'দ্বিখণ্ডিত' এর মধ্যে। নিঃসঙ্গতার প্রকাশ তাঁর লেখার অনবদ্য হয়ে প্রকাশিত হয়। তারই কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 'তবু সময় গড়াতে থাকে, দিন ফুরোতে থাকে নির্জন রোদ্দুরে, রাতগুলো অন্ধকার তক্ষকের মতো ডাকতে থাকে, আর উঠোনের উচ্ছিষ্ট কাঠের মতো বসে থাকি নিজেকে নিয়ে।' রুদ্রর চিঠির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। অর্থাৎ তসলিমা যতই রুদ্রকে ভুল থাকবার চেষ্টা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তা পারেননি। রুদ্রর হাজার দোষ থাকা সত্ত্বেও রুদ্রর কবিসত্তা লেখিকার মসে চিরনবীন। একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। "আমি যাব ঝিনাইদহে, এ যাওয়া কোনো উৎসবের আনন্দে শরীক হওয়ার জন্য নয়। এ কেবলই রুদ্রর পাশে থাকার জন্য। তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে আমার, আমরা আর স্বামী-স্ত্রী নই, কিন্তু এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কাছের মানুষ কে আছে আর রুদ্র ছাড়া।" এই স্বীকারোক্তি, একজন উদরমনা নারীর মুক্ত আকাশে ভালোবাসার ডানা মেলে উড়বার কথা স্মরণ করায়। যার মধ্যে কোনো জড়তা নেই। এ এক কৃত্রিম ভালোবাসা। তবে এ ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভালোবাসার ক্ষতই তাকে পরবর্তী জীবনে সত্য বলায় নির্মম করে তুলেছিল। রুদ্রহীন তসলিমার জীবন মোড় নেয় অন্যদিকে। এই অংশটির লেখিকা নাম দেন 'অন্যভূষণ'। ১৯৮৯ সালে

'সকাল প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনী শুরু করেন। এইসময় অনেক গল্পকার, নাট্যকার, কবির সঙ্গে তসলিমার সাক্ষাৎ ঘটে। কেউ কেউ উদারচিত্তে হাত বাড়িয়ে দেয়, লেখিকার দিকে। সেই হাত বাড়ানোর মধ্যেও পুরুষের ক্ষুধার্ত লোভী দৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কবি হেলাল হাফিজ, ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কবি হেলাল হাফিজ, যাঁর কবিতা উনসত্তরে হাজার হাজার মানুষকে উজ্জীবিত করেছে, তিনি তসলিমাকে প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু তসলিমা না বলায়, অভিমানে লেখেন – 'আমারে কান্দাইয়া তুমি।। কতখানি সুখী হইছ, একদিন আইয়া কইয়া যাইও।' গল্পকার, ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে তসলিমার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখিকা এই সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে 'দীর্ঘকাল পুরুষ স্পর্শহীন এই শরীরে এত তৃষ্ণা ছিল বুঝিনি। আমার শরীর জেগে ওঠে শুভ্র বিছানায়। সে শরীরকে সুখের চাদরে ঢেকে দেয় মিলন। ভেতরে যে সংস্কার ছিল আমার, স্বামী নয় এমন কারও সঙ্গে মৈথুন সঙ্গত নয়, সেটি শালিমার বাগানের ঝড়ো হাওহায় তুলোর মতো উড়ে যায়। মিলনের চেয়ে আপন এ জগতে কেউ নেই আমার, এরকম মনে হয়।' এই সমস্ত কথাগুলিও সাহসী নারী হিসেবে লেখিকার প্রতিভাকে প্রকাশিত করে। যদিও পাঠক সমাজে এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। কেউ আবার প্রশ্ন করে ওঠে নিজের বিকৃত যৌনাচার পাঠকের সামনে প্রকাশ করে- আদৌ সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় কি? আসলে রক্ষণশীল সমাজ এই ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারেননি। এর পরও তসলিমার জীবনে একের পর এক পুরুষের আনাগোনা ঘটতে থাকে। 'খবরের কাগজ' এর সম্পাদক নাইম এর সঙ্গেও তসলিমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠে। নাইমের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবি, কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তসলিমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তসলিমার সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। তবে নাইমের সঙ্গে বিবাহ বর্হিভূত এই সম্পর্ককে কেউ মেনে নেয়না। সেইজন্যই তসলিমার পিতার জিজ্ঞাসা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ – "কে এই ছেলে, কী এত মাখামাখি এর সাথে? বাড়ির সবার মুখে চুন কালি দিয়া বিয়া করছিল নিজের ইচ্ছামতো। তারপর কি হইল? জামাই এর সাথে তো দুইদিনও টিকতে পারে নাই। এহন আবার কোন ব্যাডার সাথে ঘুরাঘুরি করে? মাইনসে তো বেশ্যা কইব এরে। কোনও পুরুষ মানুষ আমার বাসায় যেন না আসে।' আসলে নারীর স্বাধীনতা থাকা যে উচিত নয়, এই কথাগুলি আরও একবার তা প্রমাণ করে দেয়। নাইমের বিয়ের প্রস্তাবে তসলিমা সাড়া দেয়। কিন্তু তাঁর মতে বিবাহ কেবল কয়েকটা সই এর প্রতিফলন মাত্র। এই সামান্য সই দিয়ে দুজন অচেনা-অজানা মানুষ সারাজীবন একসঙ্গে ঘর করে। এই প্রচলিত প্রথাকে লেখিকা খুব একটা ভালোভাবে নেয়নি। তসলিমার কথায় "দুজনের সই, আর কিছু টাকা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেও সই হল, টাকাও দেওয়া হল। সেইরাতে নাইমের ইস্কাটনের বাড়িতে ফিরে দুজনের শোয়া হল, প্রথম শোয়া। শুতে হলে কি সই করে শুতে হয়! সই না করেও তো হয়।" এই স্বাধীন চিন্তাধারা তসলিমার মতো লেখিকার পক্ষেই সম্ভব। অতি বাস্তব এই সত্যগুলিই তসলিমার 'দ্বিখণ্ডিত' কে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করিয়েছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানলেই তাঁর প্রাপ্য লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। 'দ্বিখণ্ডিত' সম্পর্কে যাবতীয় বিতর্ক আরও একমাত্র এই কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে নাইমের সঙ্গেও শেষ সম্পর্ক টেকেনা। এই নাইমের মতো লোকেরা যতই সংবাদপত্রে নারী স্বাধীনতার কথা বলুক, কাজের বেলায় এরা সেই পুরুষতন্ত্রেরই দাপুটে নেতা। স্বাধীন মুক্তমনা মুখোশের আড়ালে নাইমের মতো চরিত্রের বার করে আনা, আসলে অন্ধকারে কালো মুখোশকে বার করার মতোই। এরপরই তসলিমাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কুৎসা ছড়ানো হয়। তখন তসলিমাকে তাঁর পিতা ময়মনসিংহে এক মাস বন্দী করে রেখে দেন। মিনার নামের এক বন্ধু তখন তসলিমার আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে। এখানেও সেই সই করে বিবাহ এর প্রসঙ্গ উঠে আসে। তসলিমার মন এখানে যেন কিছুটা দ্বিধাবিভক্ত, আত্মজিজ্ঞাসায় দ্বিখণ্ডিত। এই ভিন্ন মতের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে 'আমি বোধবুদ্ধি লোপ মানুষের মতো সই করি' – সই এর গূঢ় অর্থ কী তা বোঝার বা ভাবার সময়টুকু নিইনি। সই কেন করি, বাবার উপর রাগ করে! আর কোনো আশ্রয় নেই বলে! এই দুটোর কোনোটিই আমি মানতে পারিনা। এই আত্মবিশ্লেষণের নিষ্ঠা এবং আত্মন্বেষণের গভীর স্পৃহা তসলিমার মতোই নারীর পক্ষেই সম্ভব। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো রুদ্র, নাইম, মিনার – এরা আসলে কেউ প্রেমিক নয়; পুরুষ। যখনই এদের ইচ্ছা হয়েছে তখনই নারীকে এরা ব্যবহার করেছে, আবার প্রয়োজনে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

নাইমের 'খবরের কাগজ'-এ তাঁর প্রথম কলাম বের হয়। পাঠক সাদরে এই লেখাকে অভ্যর্থনা জানায়। 'কেউ বলে সাংঘাতিক। কেউ বলে খুব সত্যকথা। কেউ বলে মেয়েটি খুব সাহসী। কেউ বলে কলাম পড়ে আমি কেঁদেছি। কেউ নাক সিঁটকায়, বলে এসব ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ বলে পুরুষ বিদ্বেষী। এই কলামের লেখা খুবই জনপ্রিয় হয়। এর মধ্য রুদ্রর মৃত্যু তসলিমাকে যথেষ্ট আহত করে। একদিকে ডাক্তারি অন্যদিকে লেখালেখি নিয়ে চলতে থাকে তসলিমার জীবন। দেশ বিদেশ আস্তে আস্তে সুপরিচিত হন। আর এর সঙ্গে 'বিতর্কিত' শব্দটিও যোগ হয়। 'তসলিমা নাসরিন তোষণ কমিটি' তার বিরুদ্ধে গঠিত হয়। তাঁকে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করে 'মেয়ে হয়ে আপনি পুরুষের মতো লিখতে যান কেন?' তসলিমার

জবাব – ‘আমি পুরুষের মতো লিখব কেন? আমি আমার মতো করে লিখি।’ এই বৈষম্যের শিকার আসলে তসলিমার মতো প্রত্যেক নারী। তসলিমার নাম সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। তবে এই সব বিতর্কের মাঝেও ১৯৯২ সালে ‘নির্বাচিত কলাম’-এর জন্য আনন্দ পুরস্কার, লেখিকা হিসাবে তাঁর মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় এইভাবে – ‘বাংলা সাহিত্যে আনন্দ পুরস্কার হচ্ছে বড় পুরস্কার। সবচেয়ে নামী। সবচেয়ে দামী। বাংলাদেশের কেউই এপর্যন্ত এই পুরস্কার পায়নি। আর আমি সেদিনের এক লেখক, তাও শখের লেখক, শখে কবিতা লিখি, প্রয়োজনে কবিতা লিখি! আমি কিনা পাচ্ছি এই পুরস্কার! কি করে সম্ভব এটি! অসম্ভব অবিশ্বাস্য এটি একটি ঘটনা।’ আসলে যে মানুষ মানুষটি নারীদের যন্ত্রণা, হাহাকার নিয়ে লিখে গেলেন, ধর্ষিতা নারীর যন্ত্রণা লেখায় তুলে আনলেন, এই পুরস্কার তাঁর যোগ্য প্রাপ্তি। তবে আনন্দ পুরস্কার পাওয়া নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। অনেকে বলেন সুনীলের সঙ্গে সখ্যতার জন্যই এই পুরস্কার প্রাপ্তি।

তবে যাবতীয় বিতর্ককে দূরে রেখে বলা যায়, নারী স্বাধীনতার জাগরণী গান তসলিমার হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণত তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাগুলি খুবই সুন্দরভাবে লেখিকা তুলে এনেছিলেন। সেইজন্য নারী স্বাধীনতার মতো মানুষের এই স্বাধীনতাও প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের শরীরে জোর জবরদস্তি চলবে কেন? সে ভিখিরি হোক, কি পতিতা হোক, কি স্ত্রী হোক – সে যদি অনুমতি না দেয় কারও অধিকার আছে তাকে স্পর্শ করবার? আমার বিচারে নেই। রাষ্ট্রের বিচারে বরাবরই ধর্ষকরা পার পেয়ে যায়।’ এখানে অতি আধুনিক মনস্কা এক নারীর সমাজ ভাবনা সম্পর্কিত আধুনিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

নারীবাদী লেখিকা হিসাবে ‘দ্বিখণ্ডিত’তে যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন, সেই পর্যন্ত তবু ঠিক ছিল। কিন্তু যখনই ধর্ম নিয়ে কথা তুললেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে নেমে এল প্রতিবাদের ঝড়। ‘দ্বিখণ্ডিত’ আত্মজীবনীর একটা বড় অংশ জুড়ে আছে তাঁর ‘লজ্জা’ উপন্যাস নিয়ে জনমানসে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে ছিল তার কথা। মৌলবাদীদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক শিল্পীর প্রকাশ্য ফতোয়া জারী করা হয়। সরকারের নির্দেশেই তসলিমাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়। তিনি কোনো প্রাথিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, ফলে একদল মানুষের উপর আর এক দল মানুষের অত্যাচারের কাহিনি তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। ‘নিজেকে আমার মনে হতে থাকে আমি তাঁতি বাজারে বাস করা এক হিন্দু নামের যুবক। সুরঞ্জন দত্ত, আমি ধর্ম মানি না, আমি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, আমার বন্ধুরা বেশিরভাগই ধর্মহীন, আমার দেশকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, দেশের মঙ্গলের জন্য দিনরাত ভাবি আমি, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস আমাকে চূর্ণ করে দিচ্ছে, আমার আদর্শ ধ্বসে পড়ছে, দেশের জন্য আমার ভালোবাসা, আমার আবেগ নিভে যাচ্ছে।’ ‘লজ্জা’ উপন্যাসে সুরঞ্জন নামের যুবকের কথা এভাবে উঠে এসেছে। তার দেশপ্রেমি থেকে দেশদ্রোহী হবার বৃত্তান্তও আমরা উপন্যাসে পাই। এছাড়া হিংসার নানা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপন্যাসে এসেছে। এই সব কারণেই ‘লজ্জা’ উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়। ‘বইটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯-ক ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এর সকল কপি বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে-১১ই জুলাই ১৯৯৩।’ সেনাবাহিনীর মহাপরিচালকের কাছ থেকে চিঠি আসে তসলিমার কাছে। কারণ ‘লজ্জা’ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছে। এভাবে তসলিমাকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। আহমদ ছফা বলেন, ‘লজ্জা’ একটি ইতর শ্রেণির উপন্যাস।’ হুমায়ুন আজাদ লেখেন – ‘তসলিমার লেখা অত্যন্ত নিম্নমানের’। এমনকি তসলিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় বি.জে.পি.-এর কাছ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা নিয়ে তসলিমা ‘লজ্জা’ লিখেছেন। এভাবে যতই লেখিকার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করা হোক না কেন সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর কলমে ঘটবে, একথা হলফ করে বেলা যায়। উপন্যাসটি আসলে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ততম বর্বরতার নিদর্শন। আর এই ভাবেই ‘দ্বিখণ্ডিত’ আত্মজীবনীতে ‘লজ্জা’ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে তোলা মৌলবাদীদের চড়া সুরের সমালোচনা করেছেন। এজন্যই ‘লজ্জা’ উপন্যাসের প্রথম পাতায় লেখিকা লিখেছেন-- ‘ধর্মের অপর নাম মনুষ্যত্ব হোক।’ এভাবে মনুষ্যত্বকে খুঁজে আনার সন্ধানে লিপ্ত হন তিনি। এখানেই তসলিমা থেমে থাকেন নি।

তাঁর সমালোচনায় উঠে আসে রাষ্ট্রপতি হিসাবে এরশাদের সমলোচনার কথা। বাংলাদেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করাকে তিনি ঠিকভাবে মেনে নেননি। তাঁর কথায় রাষ্ট্রের কখনো ধর্ম থাকে না। বাবরি মসজিদ ধ্বংস কান্ডে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর চড়িয়েছেন তিনি। আর এখানেই মৌলবাদীদের রাগের কারণ। ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্র নিয়ে মতপ্রকাশের পরবর্তী সময়ে মৌলবাদীদের নোংরা রাজনীতির চাপে বাধ্য হয়েছেন ‘দ্বিখণ্ডিত’ থেকে কিছু অংশ বাদ দিতে। পশ্চিমবঙ্গেও এনিয়ে বড়ই টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবার তাঁর লেখাকে নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ‘আপনি মুসলমান হয়ে হিন্দুদের নিয়ে গল্প কেন লেখেন? ধর্মের কলকাঠিতে যে সাহিত্যেও ভাগ হতে পারে, এই দৃষ্টান্তও দেখতে হয় লেখিকাকে।

পরিশেষে বলতে হয় আমরা এমন এক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করি যেখানে নারী স্বাধীনতার কথা বললে, নারী লেখিকাদের আমরা আড়চোখে দেখি। মনের অজান্তেই বলে উঠি তুমি নারী, তোমার এত কথা কেন? নারী কণ্ঠস্বরকে গলা টিপে হত্যা করার পেছনে দায়ী আমরা। আমরা চাইনা বইয়ের পাতায় কোন নারী তার শয্যাসঙ্গিনীর বর্ণনা দিক। পুরুষ একাধিক যৌন সংসর্গ করলে আমরা আপত্তি তুলিনা কিন্তু নারীর একাধিক যৌন সংসর্গ সামাজিক অবক্ষয়ের নজির। একজন স্বাধীনচেতা নারীর কণ্ঠস্বর এভাবে রুদ্ধ করে দেওয়া রাষ্ট্র বা সমাজের কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেকথা সময়ই বলবে- আমরা তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। ক্রমাগত মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে লেখিকা হিসাবে তিনি বেপরোয়া হয়েছেন কোথাও কোথাও। কোথাও ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে কথা তুললেই বিতর্কের ঝড় উঠে আসে। আসলে সমাজটাকে চালায় এক শ্রেণির মৌলবাদীরা। তাদের নিয়ন্ত্রণেই সমাজব্যবস্থা অগ্রসর হয়। তাই যখনই কোন লেখক বা লেখিকা নির্দিষ্ট ধর্মীয় বেঁড়াজালের বাইরে উঠে স্বাধীন মনোভাবকে প্রকাশ করতে যায় তখনই মৌলবাদী শক্তিরা তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে থাকে। তসলিমাও এই নির্মম মৌলবাদীদেরই শিকার। গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতার পক্ষে যেখানেই সমস্ত বিশ্ব সমর্থন করছে সেখানে লেখিকার মাথার দাম প্রকাশ করা হয়। এর থেকে লজ্জার আর কি আছে?

'দ্বিখণ্ডিত' তসলিমার রাষ্ট্রের গজিয়ে ওঠা ধর্মের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের আখ্যান। তাঁর কথায় 'আমি কোন ধর্ম দেখিনা, আমি দেখি মানুষ'। এই আত্মজীবনীটি নারীজাগরণের এক টুকরো আভাসমাত্র। আগ্নেয়গিরির লাভা বিস্ফোরণ একদিন ঘটবেই, সেদিন কোনো কিছুকেই দমন করা যাবে না। এই স্বাধীন কণ্ঠস্বরকে অকুণ্ঠ চিত্তে সম্মান জানায়। 'দ্বিখণ্ডিত' একবার নিষিদ্ধ হয়েও পাঠকসন্মুখে এর চাহিদা সবসময় বজায় থাকবে বলেই বিশ্বাস করি। জানিনা ধর্ম সম্পর্কিত স্বাধীন মতবাদ আর নারীজাগরণের উপর অত্যাচার কবে বন্ধ হবে, যেদিন নারী মেলবে মুক্ত আকাশে ডানা, পাবে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। আর লেখিকার মতো নারীদের কলম চলতেই থাক, অনবরত এ প্রার্থনা করি। তসলিমার কথায় 'Come what may, I will continue my fight for equality and justice without any compromise until my death. Come what may, I will never be silenced.' এটাই ধ্রুব সত্য হোক।

তথ্যসূত্র :

আকর গ্রন্থ :

১) নাসরিন তসলিমা, 'দ্বিখণ্ডিত', পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা-০৯ প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০১০।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

২) আজাদ হুমায়ুন, 'নারী', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, আগষ্ট ২০১২।

৩) আমিন সোনিয়া নিশাত, 'বাঙালির মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০২।

৪) গুন সুমন (সম্পাদনা) : 'তসলিমা', প্যাপিরাস, কলকাতা-০৭, ১৯৯৪।

৫) চক্রবর্তী উষসী : 'মেয়েঘেঁষা লেখারা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, বইমেলা, ২০১৩

৬) চক্রবর্তী রামী : 'কথাসাহিত্যে নারী পরিসর ও অন্যান্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩।

৭) নাসরিন তসলিমা : 'কলাম সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৮।

৮) নাসরিন তসলিমা ও ভদ্র সুজাতা (সম্পাদিত) : 'নিষিদ্ধ মত দ্বিখণ্ডিত পথ', পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা ৭৩, বইমেলা জানুয়ারী ২০০৬।

৯) নাসরিন তসলিমা : 'লজ্জা', আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১০ (চতুর্দশ মুদ্রণ)।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১০) অন্তর্মুখ : বাংলা গবেষণা পত্রিকা পর্ব ২, সংখ্যা ৩, ত্রৈমাসিক, বহুরূপে নারী, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০১২।

১১) 'পরিকথা', সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, 'সমাজ সময় : বাংলাদেশের উপন্যাস' কলকাতা-৫৪।